বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহজুল বালাগা পরিচিতি

সঙ্কলক : আলহাজ্জ মোহাম্মদ সামিউল হক

ভূমিকা

মুসলিম বিশ্বের অমূল্য সম্পদ। মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরাট একটা অংশের কাছে যেমনি সহীহ বুখারি ও মুসলিমের স্থান পবিত্র কোরআন শরিফের পরে, তেমনি আরেটটি অংশের কাছে নাহজুল বালাগার অনুরূপ অবস্থান রয়েছে। যেসব মুসলমানেরা "নাহজুল বালাগা" মেনে চলেন, তারা বুখারি ও মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সব গ্রন্থকেই বিনা দিধায় অধ্যয়ন করে থাকেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য য়ে আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেম ওলামা হযরত আলী কারামুলাহ ওয়াজহাহুর প্রতি ভালবাসা রাখলেও তাঁর বর্ণিত সহীহ হাদীস গ্রন্থটিকে মুসলিম সমাজের কাছে তুলে ধরেন না। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) 'র সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছেঃ

انا مدينة العلم و علي بابها

আমি জ্ঞানের শহর আর আলী তার দরজা।[১]

তাই সারা বিশ্বের ধর্মপ্রান মুসলমান ভাইদের আহ্বান জানাচ্ছিঃ আসুন, আমরা সবাই একবার নাহজুল বালাগা ও তার আনুসাঙ্গিক বই সমূহ অধ্যয়ন করে দেখি যে তার কাছ থেকে বর্ণিত গ্রন্থটিতে উপরিউক্ত হাদীসের কতটুকু বাস্তবতা দেখতে পাই।

এরূপ একটি আলোচনা রেডিও তেহরানের বাংলা বিভাগ পরিচালিত ওয়েভ সাইডে রয়েছে। তাদের ঐ আলোচনার গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের তার ব্যাকরণগত কিছু রয়ে যাওয়া ভুল সংশোধন করে এই সাইডেও দিচ্ছি, যাতে সাধারণ মুসলমানদের বিরাট অংশ তা অধ্যয়ন করে উপকৃত হতে পারেনঃ[২]

---

[১]। শেইখ সাদুক (মৃঃ ৩১৪ হিঃ), আল আমালি, ইসলামী পাঠ্যসূচী প্রকাশনা, কোম-ইরান, প্রকাশকাল : ১৪১৭, হিজরি, পৃঃ ৪৭২; শেইখ আব্দুল হোসাইন আমিনি, দারুল কুতুব প্রকাশনা, বৈরুত, প্রকাশকাল : ১৩৮৭ হিজরি আল গাদীর,খন্ড ৭,পৃ : ১৯৮

[২]। উক্ত ওয়েভ সাইডের ঠিকানাঃ www.bangla.irib.ir

www.banglaradio.ir

মালঞ্চ-১

ইমাম আলী (আ:) এর চিন্তাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাহজুল বালাগা আসর মালঞ্চে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এ আসরে আমরা আপনাদের নিয়ে যাবো নাহজুল বালাগার সুগন্ধি উদ্যানে। সেখানে বিচিত্র ফুলের ঘ্রাণে ভরে যাবে আপনার হৃদয়মন। মুগ্ধ হয়ে উঠবেন বক্তব্যের গভীরতায় ও ভাষাভঙ্গির ওজস্বিতায়। কারণ এই বক্তব্য, এই চিন্তা-চেতনা এমন একজন মহান নজির বিহীন ও পূত-পবিত্র ব্যক্তিত্বের, যাঁর অন্তর ছিল সবসময় খোদায়ী প্রেম তথা মারেফাতের আলোয় আলোকিত। তাই চৌদ্দটি শতাব্দি পেরিয়ে যাবার পর আজো নাহজুল বালাগার চমকৃতি আর অনিন্দ্য সৌন্দর্যে বর্তমান পৃথিবীর মানুষ মুগ্ধ।

মিশরের সাবেক মুফতি শায়খ মোঃ আবদুহ স্বদেশের বাইরে গিয়ে নাহজুল বালাগার সাথে পরিচিত হন। নাহজুল বালাগায় বিষয়গত যে বৈচিত্র্য রয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এই গ্রন্থটি পড়ে যেভাবে পরিতৃপ্তি লাভ করেন, তা দেখে তিনি কেবলই বিস্মিত হন। এই বিস্ময় তাঁর ভেতর একটা বোধ ও উপলব্ধি জাগিয়ে দেয়, তাহলো তিনি অত্যন্ত মূল্যবান একটি সম্পদ বা রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ নাহজুল বালাগার একটি সংস্করণ ছাপার উদ্যোগ নেন যাতে বিখ্যাত এই গ্রন্থটির সাথে বিশ্ববাসীর পরিচয় ঘটে। তিনি বলেন-আরবি ভাষী জনগোষ্ঠির মাঝে এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি মনে করেন না যে, কোরআন এবং হাদিসের পর সবচে অভিজাত, অলংকার সমৃদ্ধ, অর্থবহ এবং পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য হলো হযরত আলী (আ) এর বক্তব্য।

কায়রো ইউনিভার্সিটির স্টাডিজ (জুম) অনুষদের প্রধান আলী আল জানদি -কবিতা ও আলী (আ) এর মণীষা- নামক গ্রন্থে লিখেছেন, অনেকেই আছেন স্বল্পভাষণে বেশ প্রাজ্ঞ। আবার কেউ কেউ দীর্ঘ বক্তব্য প্রদানে অভ্যস্থ। আলী (আ) উভয় ক্ষেত্রেই ছিলেন ভীষণ পারদর্শী ও অগ্রবর্তী। যেমনটি সর্বপ্রকার ফযিলতের ক্ষেত্রেও সবার উপরে। হাজার বছর আগে আলী (আ) এর কথামালার বাইরেও তাঁর খুতবা বা ভাষণগুলো, চিঠিগুলো, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি গুলোকে যিনি একত্রিত করে নাহজুল বালাগা নামে সংকলিত করেছেন, সেই মহান সংকলক সাইয়্যেদ রাজি বলেন- আলী (আ) এর ব্যাপারে বিস্ময় হলো পরহেজগারী, জাগৃতি ও সচেতন হবার জন্যে তিনি যেসব বক্তব্য রেখেছেন, মানুষ সেসব শুনে গভীরভাবে চিন্তা করতো যে যিনি এই ধরনের বক্তব্য রাখেন তিনি পার্থিব সম্পদ চিন্তা থেকে দূরে থাকা এবং পরহেজগারীর বাইরে আর কিছুই চেনেন না।

ইমাম আলী (আ) এর বক্তব্য ছিল অবিশ্বাস্যরকম প্রভাব বিস্তারকারী। সমাজে তিনি ছিলেন এক মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। আবার যুদ্ধের ময়দানেও তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর আন্তরিক সাহস ও প্রেরণা সৃষ্টিকারী। অকুতোভয় বীরত্বের সাথে তিনি শত্র ***সক্র***দের ভুপাতিত করতেন। আবার তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ একজন পরহেজগার এবং শ্রেষ্ঠ একজন আবেদ বা প্রার্থনাকারী।

নিঃসন্দেহে হযরত আলী (আ) এর বক্তব্যগুলো ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে উৎসারিত। রাসূলে খোদা (সা) সবসময় তাঁর বক্তব্যে ইমাম আলী (আ) এর এই বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির কথা উল্লেখ করতেন। সেইসাথে নবীজী বলতেন জনগণ যেন আলী (আ) এর এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারাকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে উপকৃত হয়। নবীজী বলেছেন-

انا مدينة العلم و علي بابها

অর্থাৎ আমি হলাম জ্ঞানের নগরী আর আলী হলো সেই নগরীর দরোজা।

আমরা বরং আলী (আ) এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে জানতে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য শোনার চেষ্টা করি। একদিন আলী (আ) এর একজন সঙ্গী চেয়েছিল কিছু বলতে। পারলোনা, বরং সে তোতলাতে শুরু করলো। হযরত আলী (আ) তখন বললেন-জবান হলো মানুষের একটা অঙ্গ এবং তা তার ধী-শক্তি, স্মরণশক্তির অন্তর্গত। এগুলো যদি কাজ না করে তাহলে বাকশক্তি কোনো কাজই করতে পারে না। তবে স্মৃতিশক্তি যদি খুলে যায় তাহলে বাক-প্রত্যঙ্গও উন্মোচিত হয়। এরপর আলী (আ) বলেন, আমরা হলাম কথার সৈনিকদের কমান্ডার। আমাদের মাঝে কথার বৃক্ষ শেকড় গজায় আর মাথার ওপরে ঝোলে তার শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব।

পাঠক! আগামী আসরে আমরা ইবাদাত বিষয়ে নাহজুল বালাগায় বর্ণিত বিভিন্ন বক্তব্য ও কথামালা নিয়ে খানিকটা আলোচনা করার চেষ্টা করবো। তো আজকের আসর থেকে বিদায় নেবো ইমাম আলী (আ) এর একটি বাণী শুনিয়ে। তিনি বলেছেন-কারো গোলামি করো না, কেননা আল্লাহ তোমাকে স্বাধীনতা ও আযাদি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

মালঞ্চ-২

অলি-আউলিয়াগণ আল্লাহর সাথে ব্যাপক সম্পর্কের দৃঢ়তায় এতোদূর অগ্রসর হয়ে যান যে সাধারণ মানুষ তাঁদের অস্তিত্বের ফযিলতের গভীরতায় পৌঁছুতে পারেন না। ইমাম আলী (আ) আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী তেমনি একজন মহান অলি। গত আসরে আমরা এ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আপনাদের। এ-ও বলেছি যে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলোর একটি সংকলন করা হয়েছে নাহজুল বালাগা নামে। এটি একটি স্বচ্ছ-নির্মল ঝর্ণাধারার মতো যার সাহায্যে তাঁকে যেমন ভালোভাবে চেনা যাবে তেমনি আল্লাহকে চেনার উপায়গুলো সম্পর্কে জানা যাবে। তো চলুন, আমরা বরং সরাসরি আলোচনা শুরু করি। নাহজুল বালাগায় চিত্তাকর্ষক যেসব বিষয় রয়েছে, ইবাদাত এবং আল্লাহর জিকির তার মধ্যে অন্যতম। ইবাদাত সম্পর্কে মানুষের মাঝে যেসব দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় তা অভিন্ন নয়। কেউ কেউ ইবাদাত সম্পর্কে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন এবং কেবল এক ধরনের দায়িত্ব

হিসেবে পালন করেন। আবার অনেকেই ইবাদাতকে দেখেন আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই নাহজুল বালাগায় লক্ষ্য করা যাবে। ইমাম আলী (আ) এর দৃষ্টিতে ইবাদাত হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির সিঁড়ি এবং আল্লাহকে সাধ্যমতো চেনার আন্তরিক প্রয়াস। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো ইবাদাত। আলী (আ) ইবাদাতের আত্মা বলতে আল্লাহকে স্মরণ করাকেই বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন- আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর জিকিরকে অন্তরের মরীচা দূর করার উৎসের সাথে তুলনা দিয়ে বলেছেন এর মাধ্যমে শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তিআনুগত্য লাভ করে। এরকম সবসময়ই ছিল এবং আছে যে, আল্লাহ কালের সর্বযুগেই এমনকি যেসময় ***নবী***-রাসূলগণ ছিলেন না তখনো এমন কিছু বান্দার অস্তিত্ব রেখে দিয়েছেন এবং এখনো রক্ষা করছেন যাঁদের সাথে তিনি তাঁর অনেক রহস্য নিয়ে কথা বলেন এবং তাদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আল্লাহ তাঁদের সাথে কথা বলেন। আলী (আ) এ ধরনের ইবাদাতকারীদের অবস্থান সম্পর্কে বলেন : ফেরেশতারা তাঁদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাদের ওপর শান্তির ছায়া নেমে এসেছে। তাঁদের জন্যে আকাশের দ্বারগুলো উন্মুক্ত হয়ে গেছে। তাঁদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের শেষ নেই। আল্লাহর বন্দেগি করার মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহর দরবারে অনেক উচ্চ মর্যাদা ও অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। তাঁদের কর্মকাণ্ড তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহর পছন্দনীয় বলেই প্রশংসনীয় হয়েছে। যাঁরা এভাবে আল্লাহকে ডাকেন, তাঁরা আল্লাহর ক্ষমা ও মাগফেরাতের সুগন্ধি অনুভব করেন এবং গুনাহের কৃষ্ণ পর্দা অপসারণকে অনুভব করেন। ইসলামে ইবাদাত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সমান্তরাল। আর ইবাদাত বিষয়টাই ইসলামে সমষ্টিগত, ব্যক্তিগত নয়। অর্থাৎ সবাই মিলে একত্রিত হয়ে এই ইবাদাত পালনের বিধান রয়েছে ইসলামে। এতে ব্যাপক সামাজিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে পালনীয় ইবাদাত যে নেই তা নয়। তবে সেগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি তাঁর জীবনের করণীয় কর্মের অংশের সাথে পরিচিত হয়। যেমন নামায। নামায হলো ইবাদাতের পরিপূর্ণ বাহ্যিক প্রকাশ। নামায আদায়ের মাধ্যমে নৈতিক এবং সামাজিক বহু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে ইবাদাতকারী সচেতন হয়। সেইসাথে মানুষ পবিত্রতা, অন্যদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সময় জ্ঞান, দিক নির্ণয়, আল্লাহর যথার্থ বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হয়। ইসলামের সবচেয়ে বড়ো দিকটি হলো, অন্যদের ভালো ও উত্তম কাজগুলোকেও ইসলাম ইবাদাত বলে গণ্য করে। আলী (আ) ইবাদাতকে খুবই উপভোগ্য বলে মনে করেন। দুনিয়াবি মজার সাথে যার তুলনা হয় না। ইবাদাতটা উৎসাহ ও উদ্দীপনাময়। তাঁর দৃষ্টিতে তিনিই সৌভাগ্যবান ইবাদাতের প্রাণবায়ু যাঁকে স্নেহের পরশ বুলিয়ে যায়। যিনি তাঁর সকল প্রকার অভাব-অভিযোগ, চাওয়া-পাওয়ায় আল্লাহর শরণাপন্ন হন। তিনিই সৌভাগ্যবান যিনি আলোকিত ভুবনে প্রবেশ করেন এবং সকলপ্রকার দুঃখ-বেদনা থেকে যিনি মুক্ত, সেইসাথে যিনি পরিপূর্ণ স্বচ্ছ, নির্মল ও আন্তরিক। এ ব্যাপারে নাহজুল বালাগা থেকেই বরং সরাসরি আলী (আ) এর বক্তব্য শোনা যাক। কী

সৌভাগ্যবান তিনি, যিনি আল্লাহ প্রদত্ত কর্তব্যগুলো পালন করেন। আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী। আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ফলে তাঁর কষ্ট ও অশান্তিগুলো যাঁতাকলের মতো পিষে গুঁড়ো হয়ে যায়। তিনি রাতের বেলা নিদ্রা থেকে দূরে থাকেন এবং রাত জাগেন। এঁরা হলো সেই দলভুক্ত যাঁরা প্রত্যাবর্তন দিবসের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন এবং যাঁদের চোখ থেকে ঘুম অপহৃত হয়েছে, যাঁরা নিজেদের ঘুমের ঘর থেকে উঠে আল্লাহর জিকিরে মশগুল হয়ে পড়েন। এঁরা আল্লাহর দলভুক্ত এবং পরিত্রাণপ্রাপ্ত।

মালঞ্চ-৩

পাঠক! ইমাম আলী (আঃ) এর চিন্তাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাহজুল বালাগা বিশ্লেষণমূলক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান মালঞ্চের আজকের আসরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আলী (আঃ)এর বাণী কোরআনের পর সবচেয়ে অলংকারপূর্ণ ভাষার নিদর্শন। মানব সভ্যতা ও ঐতিহ্যে আলী (আঃ) এর সাহিত্য যুগ যুগ ধরে ছিল, আছে এবং থাকবে। আলী (আঃ) যে কতোটা জ্ঞানী ছিলেন, কতোটা ওজস্বী ভাষার অধিকারী ছিলেন, কতো দূরদর্শী এবং সূক্ষ্মদর্শী মনীষী ছিলেন-বর্তমান সংঘাতবহুল বিশ্বে তাঁর বক্তব্যগুলোর যথার্থতা চিন্তা করে বিশ্বের সকল জ্ঞানী-গুণীই তাঁকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করে। এই কথাগুলো জর্জ জারদাক নামক একজন খ্রিষ্টান লেখকের। তিনি আলী (আঃ) এর জীবনী, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর বাণী বা [1]বক্তব্যগুলো ভালো করে পড়ে বলেছেন-বর্তমান বিশ্বের মানুষের সকল সংকট থেকে মুক্তি পাবার উপায় হলো তাঁর সাহিত্যগুলো অধ্যয়ন করা। আজকের আসরে আমরা আলী (আঃ) এর তেমনি কিছু বাণী নিয়ে কথা বলবো :

মানুষ এবং তার সৃষ্টি কৌশলকে আলী (আঃ) গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসেবে নিয়েছেন। তিনি ৮৩ নম্বর বক্তৃতার একাংশে মানব সৃষ্টির পর্যায়গুলোকে বর্ণনা করেছেন। মানুষের যেসব বিষয়ে অবশ্যই জানা দরকার সেসব সম্পর্কে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জটিল পর্দাময় অন্ধকার জরায়ুতে। সে ছিলো বীর্যের মধ্যে, তারপর হলো তরল বস্তুর পিণ্ড। তারপর ভ্রুণ বা জীবনের সূত্রপাত। এরপর পেটের ভেতর তৈরী হলো শিশু। তারপর দুগ্ধপায়ী শিশু এবং অবশেষে দেওয়া হলো হৃদয়, দেখার জন্যে চোখ, বলার জন্যে জিহ্বা। এসব দেওয়া হয়েছে এজন্যে যে যাতে ঐ শিশু নবীন যুবকের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে বুঝতে শেখে, জানতে শেখে এবং খোদার নাফরমানির পথে পা না বাড়ায়। এগুলো হচ্ছে মানব জীবনের প্রাথমিক পর্যায়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত। মানুষের আভ্যন্তরীণ দিকগুলো সম্পর্কে জ্ঞানী হযরত আলী (আঃ) একথাগুলো বলে অপরাপর প্রাণীকূলের সাথে মানুষের

১

পার্থক্যটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে শেখার মতো একটি অন্তর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, চৈতন্য দান করেছেন। কারণটা হলো সে যেন বিচ্যুতির পথে না যায়। আলী (আঃ) মানুষের জীবনের অতি স্পর্শকাতর সময় যৌবনকালের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, এই সময়টা এমন যে মানুষের ভেতরে যদি সচেতনতা না থাকে তাহলে মারাত্মক ভুলের সম্মুখীন হবে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে একজন যুবক এই বয়সে তার মনের ইচ্ছাগুলোকে মেটানোর পেছনে লেগে থাকে, আমোদ-ফূর্তি করে বেড়ায় এবং এই বয়সে সে বহু কাজ করার ক্ষমতাও রাখে। কিন্তু যথেষ্ট জ্ঞান নেই। সেজন্যে জীবনটাকে নিরর্থকভাবে হেলায় কাটিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন, সে বিশ্বাস করতে চায় না যে ব্যর্থ হবে। গুনাহ করার ক্ষেত্রে তার মাঝে কোনোরকম ভয়ভীতি কাজ করে না। এভাবে ত্রুটি-বিচ্যুতির মাঝে সে কিছু সময় কাটায়। আল্লাহ যেসব নিয়ামত তাকে দিয়েছে সেগুলোকে কোনো কাজে লাগায় না। তারপর আলী (আঃ) যৌবনকাল সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তুলে বলেন : যৌবন আল্লাহ দান করেছেন এবং মানুষ বার্ধক্যের দুর্বলতার মুখোমুখি হয়। তখন সে বহু কিছু বুঝতে শেখে। যৌবন কী জিনিস ছিল তা সে বার্ধক্যে গিয়ে উপলব্ধি করে। কিন্তু তখন তো তার সক্ষমতা বা শক্তি হ্রাস পায়। হযরত আলী (আঃ) বলেন-যৌবনের সর্বশেষ পর্যায়ে এবং সাফল্যের সর্বশেষ স্তরে মৃত্যুর যন্ত্রণা এসে তাকে গ্রাস করে। এই যন্ত্রণার ফলে সে দিনগুলোকে কাটায় দিশেহারা অবস্থায় আর রাতগুলোকে কাটায় নিদ্রাহীন উদ্বেগের মধ্য দিয়ে। প্রতিটা দিনই তার ভীষণ কষ্টে কাটে আর রাত কাটে দুশ্চিন্তা এবং রোগ-ব্যাধিতে। মৃত্যু ভয় এবং যন্ত্রণা তখন তাকে কাঁদতে বাধ্য করে। ইমাম আলী (আঃ) এরপর মানুষকে তার পরবর্তী জীবনের কথা ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন-মানুষ যখন তার ইচ্ছার বাইরে অন্যদের মাধ্যমে কবরে শায়িত হয় এবং তারপর কেউ যখন তাকে আর দেখতে না পায়, তখন জীবনটাকে অন্যায় বা অবৈধভাবে কাটানোর কারণে জাহান্নামের আগুণে তাকে তো পুড়তে হয়-সেই আগুণে পোড়ার কষ্টের চেয়ে অধিক কষ্টকর আর কি কিছু আছে ?

এভাবে আলী (আঃ) সবার অভিন্ন পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু সবার মৃত্যু কেন একরকম নয় সে ব্যাপারে তিনি বলেন-যারা তাদের জীবনটাকে পশুর মতো কেবল ভোগ-বিলাসেই কাটিয়েছে, নিজের চিন্তাশক্তি বা বিবেককে যথার্থপথে কাজে লাগায় নি। তার মৃত্যু কষ্টকর তো হবেই। আবার যিনি তাঁর ছোট্ট জীবনটাকে সচেতনভাবে সৎ পথে ব্যয় করেছে, মৃত্যু তার জন্যে সৌভাগ্য বয়ে আনে। আলী (আঃ) তাঁর বক্তব্যের সমাপ্তিতে সকল জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ হে আল্লাহর বান্দাগণ! কোথায় তারা! যারা দীর্ঘ জীবন যাপন করেছে এবং হাসি-উল্লাসে জীবন কাটিয়েছে ? যাদেরকে আল্লাহ দীর্ঘ জীবন দিয়েছেন অথচ তারা জীবনটাকে অর্থহীনভাবে কাটিয়েছে। কোথায় তারা যাদেরকে কঠিন শাস্তির ব্যাপারে জানানো

হয়েছে এবং আল্লাহর নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ? হে আল্লাহর বান্দাগণ! যতোক্ষণ তোমার দেহে প্রাণ আছে ততোক্ষণ এই সুযোগকে গণীমত বলে মনে করো। যেসব অন্যায় তোমাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় সেগুলো থেকে দূরে থাকো এবং যে সমস্ত নোংরামির ফলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সেগুলো থেকে পালিয়ে বাঁচো!

মালঞ্চ-৪

ইমাম আলী (আঃ) এর চিন্তাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাহজুল বালাগা বিশ্লেষণমূলক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান মালঞ্চের আজকের আসরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। বিশিষ্ট মুসলিম চিন্তাবিদ আল্লামা শামসুদ্দিন হানাফি বলেছেন, আলীর বক্তব্য পূত-পবিত্র এবং সততাপূর্ণ। তিনি প্রজ্ঞাময় কথা বলেন। তাঁর বক্তব্যের জন্যে আল্লাহ তাঁকে সম্মান এবং মর্যাদা দান করেছেন। আলীর বক্তব্য যারই কানে পৌঁছে সে-ই বিস্মিত হয় এবং প্রত্যেক বক্তাকেই আলীর প্রতি বিনয়ী ও বিনম্র করে তোলে। আলীর বক্তব্যের কাছে নিজেদের অগ্রগামিতা যেন অপহৃত হয়ে যায়।

পাঠক ! আজকের আসরে আমরা ইমাম আলী (আঃ) এর দৃষ্টিতে এই বিশ্ব নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

সুন্দর এই বিশ্বজগত আল্লাহর বিচিত্র নিয়ামতে পূর্ণ। মানুষ এইসব নিয়ামত থেকে উপকৃত হয়। আমরা যদি একটু মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে, এই বিশ্বকে ঘিরে মানুষের রয়েছে বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া এককথায় ব্যাপক আকর্ষণ। মানুষের ব্যাপক গবেষণার ফলে বিশ্বের সূক্ষ্ম অণু পরমাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব গবেষণায় পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টিতে যে অবিশ্বাস্যরকম শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা গেছে তা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে বিশ্ব নিরর্থক সৃষ্টি করা হয় নি। আর মানুষকেও খামোখাই পৃথিবীতে পাঠানো হয় নি। আলী (আঃ) বিশ্ব এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আল্লাহর নিদর্শন বলে মনে করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর সকল কিছুই মানুষের উপকারে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মানুষের উচিত প্রকৃতির যথাথ ব্যবহার করা। আল্লাহর অলি-আউলিয়া বা ধর্মীয় মনীষীগণও প্রাকৃতিক সম্পত তথা আল্লাহর নিয়ামতগুলোকে সৎ ও সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। হযরত আলী (আঃ) চেষ্টা করেছেন পুকুর থেকে পানি তুলে খেজুর বাগান তৈরি করতে যাতে মানুষ সেগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। পৃথিবীর সাথে মানুষের সম্পর্ককে আলী (আঃ) তুলনা করেছেন একজন ব্যবসায়ীর সাথে বাজারের সম্পর্ক কিংবা একজন কৃষক এবং কৃষিক্ষেতের সম্পর্কের সাথে। একইভাবে যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে কাজ করবে আখেরাতে তার ফল সে পাবে। আলী (আঃ) এ বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করে বলেন, পৃথিবী মানুষের সামনে দুটি বিপরীতমুখি ভূমিকায় অবতীর্ণ

হয়। প্রথমত এই পৃথিবী মানুষকে পরিত্রাণ দেয়। দ্বিতীয়ত পৃথিবী মানুষকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তেও নিয়ে যায়।

আলী (আঃ) এর দৃষ্টিতে পৃথিবীটা ঈমানদারদের জন্যে একটি উত্তম স্থান। তিনি মনে করেন দুনিয়া মানুষের জন্যে স্থায়ী কোনো বাসস্থান নয় বরং এটা মানুষের জন্যে একটা ক্রসিং-পয়েন্ট এবং পরিপূর্ণতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে লাফ দেওয়ার মঞ্চ। তিনি বলেন-পৃথিবী তার জন্যে সরল-সত্য যে তাঁর বক্তব্যের ব্যাপারে বিশ্বস্ত। পৃথিবী তার জন্যে উপযুক্ত বাসস্থান যে এখান থেকে পারাপারের কড়ি সঞ্চয় করে। পৃথিবী হলো আল্লাহর বন্ধুদের জন্যে ইবাদাতের স্থান, ওহী নাযিলের স্থান এবং অনন্ত বেহেশত প্রত্যাশী বা আল্লাহর রহমত প্রার্থীদের জন্যে বিনিময় বা লেন-দেনের স্থান। তো, দুনিয়াকে তাহলে কে খারাপ বলতে পারে?

নাহজুল বালাগায় আলী (আঃ) এর এই দৃষ্টিভঙ্গি কথোপকথনের ভঙ্গিতে এসেছে। সেখানে এক ব্যক্তি দুনিয়াকে ধিক্কার দেয় আর আলী (আঃ) তাকে তার ভুল ধরিয়ে দেয়। কবি আত্তার এই বিষয়টিকে মুসিবাত নমেহ-তে কবিতার মতো করে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবেঃ

ন্যায়পরায়ন সিংহ আলীর সামনে সে পৃথিবীকে দিয়েছে ধিক্কার প্রচুর, তবে তার হায়দার বলেন পৃথিবী নয় মন্দ, মন্দ তো তুমি, জ্ঞান থেকে দূরে অন্ধ

হযরত আলী (আঃ) এর দৃষ্টিতে যে ব্যক্তির ঈমান নেই তার জন্যে এই পৃথিবী ভয়াবহ এক নরক যা কেবল তার জন্যে ধ্বংসেরই দ্বার খুলে দেয়। এই সমস্যা এমন সময় দেখা দেয় যখন মানুষ পার্থিব এই জগতের মোহে পড়ে যায়। মানুষ যদি নিজের ব্যাপারে সতর্ক না হয় এবং এই বিশ্বজগত সম্পর্কে সচেতন না হয়, তাহলে পৃথিবীর সাথে তার সম্পর্ক ভিন্ন রূপ নেবে এবং ক্ষণিকের পথ চলার অঙ্গন এই বিশ্ব তার সামনে ভিন্ন লক্ষ্য তৈরি করবে। এরকম অবস্থায় একজন মানুষ পৃথিবীর মোহজালে আটকা পড়ে যায়। এই মোহ মানব উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। একেই বলে দুনিয়াপূজা, যার বিরুদ্ধে ইসলাম সংগ্রাম করতে বলে। আলী (আঃ) ও মানুষকে এ ব্যাপারে হুশিয়ার করে দিচ্ছেন। এ বিষয়ে পরবর্তী আসরে আরো কথা বলার চেষ্টা করবো।

মালঞ্চ-৫

পাঠক ! ইমাম আলী (আঃ) এর চিন্তাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাহজুল বালাগা বিশ্লেষণমূলক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান মালঞ্চের আজকের আসরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। নাহজুল বালাগা একটি সমুদ্রের মতো। সেখান থেকে যতোই নেওয়া হোক না কেন, কমবে না। আমরা বিশাল এই সমুদ্র থেকে বিন্দুর মতো খানিকটা আহরণের চেষ্টা করবো। গত আসরে পৃথিবীকে হযরত আলী (আঃ) কোন দৃষ্টিতে দেখেন সে সম্পর্কে কিছুটা কথা বলার চেষ্টা

করেছি, আজকের আসরে আমরা ইমাম আলী (আঃ) এর দৃষ্টিতে পৃথিবীর নেতিবাচক দিকটি নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করবো।

আলী (আঃ) পৃথিবীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, উপরে ওঠার সিঁড়ি হলো পবিত্রতা, সততা ইত্যাদি গুণাবলি। কিন্তু যখনি তিনি পৃথিবীর অসুন্দর রূপ নিয়ে কথা বলেছেন তখনি মনে হয়েছে তিনি যেন এমন কোনো ঘৃণিত ***সত্ত্ব*** সম্পর্কে কথা বলছেন যে কিনা মানুষকে সবসময় ধোকা দেয়। তিনি পৃথিবীকে এমন এক সাপের সাথে তুলনা দেন, যে সাপ দেখতে বেশ সুন্দর এবং নাদুস নুদুস অথচ তার দাঁতের নিচে আছে মারাত্মক বিষ। অন্যত্র তিনি বলেছেন-পৃথিবী তাঁর কাছে এমন একটা পাতার মতো অর্থহীন যার মুখে বসে আছে আস্ত এক ফড়িং কিংবা ছাগলের নাকের পানির মতোই তুচ্ছ। ঘৃণিত এই পৃথিবী এমন এক জগত, যে আল্লাহর কাছ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং মানবিকতাকে ধ্বংস করে দেয়।

আলী (আঃ) এরকম পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন-হে পৃথিবী! তোর ঘাড়ের লাগাম খুলে দিয়ে তোকে মুক্ত করে দিয়ে আমি তোর শক্ত বাঁধন থেকে মুক্ত হয়েছি। তোর বিচ্যুতির স্থান থেকে দূরত্ব খুঁজেছি। কোথায় তারা যাদেরকে নিয়ে তুই খেল-তামাশা করেছিস, কোথায় সেসব জাতি যাদেরকে তোর চাকচিক্যের চমক দিয়ে প্রতারিত করেছিস? আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও! খোদার কসম! আমি তোর কাছে মাথানত করবো না যাতে আমাকে তুই লাঞ্ছিত করতে না পারিস, তোর বশীভূত আমি হবো না যাতে আমাকে তুই নিয়ন্ত্রণ করতে না পারিস।

আলী (আঃ) এর মতে মানুষ যদি পৃথিবীর মোহে পড়ে যায় তাহলে সে তার উন্নত সকল মূল্যবোধকে হারাতে বসে। এ কারণেই তিনি পৃথিবীর নশ্বরতা নিয়ে বারবার কথা বলেছেন। হযরত আলী (আঃ) পৃথিবীকে কঠিন ঝড়ের সাথে তুলনা করেন, যেই ঝড় সমুদ্রের বুকের নৌকায় বসবাসকারীদেরকে মুহূর্তের মধ্যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়, আবার কাউকে কাউকে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে মারে, কেউবা ঢেউয়ের বুকে ডুবতে ডুবতে বেঁচে যায় এবং ভবঘুরে বানিয়ে ছেড়ে দেয়। আলী (আঃ) এরকম পৃথিবীর পূজা করা থেকে লোকজনকে বিরত রাখঅর জন্যে বলেন-হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করো। কেননা এই পৃথিবী তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে। তুমি তো সেই পথিকের মতো যে পথিক একটু পথ গিয়েই ভাবে পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি। তারপরও তোমার চেষ্টার ক্ষান্তি নেই। অথচ এরিমাঝে হঠাৎ মৃত্যু এসে কড়া নাড়ে তোমার দরোজায়।

পৃথিবী সম্পর্কে মানুষকে এভাবে ভীতি প্রদর্শন করানোর পর ইমাম আলী (আঃ) আল্লাহর সকল বান্দাকে স্মরণ করিয়ে দেন, তারা যেন সুস্বাস্থ্য এবং সময়-সুযোগকে গণীমৎ ভাবে

এবং মৃত্যুর বাস্তবতাকে যথার্থভাবে মেনে নিয়ে অতীতের ভুল শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করে। তিনি বলেন-হে আল্লাহর বান্দাগণ! সাবধান হও! তোমার মুখে ভাষা থাকতে থাকতে, তোমার শরীর সুস্থ থাকতে থাকতে , শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো খেদমতের জন্যে প্রস্তুত থাকতে থাকতে এবং ফিরে আসার পথ উন্মুক্ত থাকতে থাকতে সাবধান হও! সুযোগ এবং সামর্থ হারাবার আগেভাগেই হুশিয়ার হও! অনিবার্য মৃত্যুর দূত তোমার দরোজায় টোকা দেওয়ার আগে ভাগেই হুশিয়ার হও! ইমাম আলী (আঃ) বোঝাতে চেয়েছেন যে শারিরীক সামর্থ থাকতে থাকতেই আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগি বেশি বেশি করে নাও! যে-কোনো সময় মৃত্যু এসে যেতে পারে কিংবা বার্ধক্যের সময় ইচ্ছা থাকলেও ইবাদাত বন্দেগি যৌবনকালের মতো করা সম্ভব হয় না।

দুনিয়ার চাকচিক্য এমন যে এই মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্যে একটা শক্তির প্রয়োজন হয় যে শক্তি মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করে। সেইসাথে এই শক্তি পৃথিবীকে নশ্বর হিসেবে সবসময় সামনে তুলে ধরে আর অবিনশ্বর পারলৌকিক জীবনের দিকে নিয়ে যায় এবং এভাবে নিজের সত্যিকারের সৌভাগ্য নিশ্চিত করে। ইমাম আলী (আঃ) পরহেজগারী এবং খোদাভীতিকেই এই শক্তি তথা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা বলে বোঝাতে চেয়েছেন। যারা নিজেদেরকে আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে রজ্জুবদ্ধ করেছে এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টিজগতের বাস্তবতার দিকে অগ্রসর হয়েছে তাদের ব্যাপারে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে-আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরকালের শেষ বিচারের দিন কঠিন মুসবতের সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী হবেন।

মালঞ্চ-৬

পাঠক ! ইমাম আলী (আঃ) এর চিন্তাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাহজুল বালাগা বিশ্লেষণমূলক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান মালঞ্চের আজকের আসরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। গত আসরে আমরা পৃথিবীর নেতিবাচক দিক সম্পর্কে আলী (আঃ) এর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলাম। আশা করি আপনাদের মনে আছে। আজকের আসরে আমরা মানুষের জীবন শৃঙ্খলা সম্পর্কে ইমাম আলী (আঃ) এর উপদেশ বা দিক-নির্দেশনা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

পৃথিবীতে মানুষের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি হলো অব্যাহত কর্মচাঞ্চল্য, এটা মানুষের ব্যক্তিজীবনের অবশ্যম্ভাবী একটি প্রয়োজনীয়তা। ইমাম আলী (আঃ) মানুষের অস্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কে গভীরভাবে দৃষ্টি রাখেন। এক্ষেত্রে তিনি আরেকটি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে মনে করেন। সেটা হলো মানুষের জীবনটাকে যথার্থ ও সঠিকভাবে যাপন করার জন্যে প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং শৃঙ্খলা। যেই শৃঙ্খলা তাকে উন্নতি ও সৌভাগ্যের পথে নিয়ে যায়। হযরত আলী (আঃ) এর মতে মানুষের উচিত তার সময়ের একটা অংশ জীবনের কল্যাণমূলক বিষয়গুলোর জন্যে ব্যয় করা এবং আরেকটি অংশ ব্যয় করা উচিত মানসিক স্বস্তি ও আত্মিক প্রশান্তির জন্যে। ইমাম আলী (আঃ) এর মতে মানুষের উচিত তার জীবনের

একটা সময় জীবনের কল্যাণমূলক বিষয়গুলো নিশ্চিত করার জন্যে ব্যয় করা এবং অপর একটা সময় ব্যয় করা উচিত আত্মিক শান্তি এবং মানসিক স্বস্তি নিশ্চিত করার জন্যে। আর এ প্রশান্তির ব্যাপারটি একমাত্র ইবাদাত-বন্দেগী বা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই কেবল অর্জিত হয়।

মানুষের সময়ের তৃতীয় অংশটি তার শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লালনের জন্যে ব্যয় করা উচিত যাতে তার জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পাদনের শক্তি লাভ করতে পারে। হযরত আলী (আঃ) এ সম্পর্কে বলেন, মুমিন জীবনের কর্মপরিকল্পনায় তিনটি সময় সুনির্দিষ্ট আছে। একটা হলো তার স্রষ্টার ইবাদাত-বন্দেগির সময়। দ্বিতীয় সময়টা হলো যখন সে তার জীবনযাপন ব্যয় নিশ্চিত করার জন্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় আর তৃতীয় সময়টা হলো তার সৎ আনন্দগুলো আস্বাদনের সময়। আজকের আলোচনায় আমরা ইমাম আলী (আঃ) এর বক্তব্যের তৃতীয় অংশটার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেবো-যেখানে তিনি জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ ও সুস্থ বিনোদনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। দুঃখজনকভাবে বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ দৈনন্দিন জীবন সমস্যায় এতো বেশি জর্জরিত যে, নিজের দিকে তাকাবার সময় খুব কমই মেলে। যার ফলে আমরা লক্ষ্য করবো যে মানুষ তার নিজের সম্পর্কে মানুষ উদাসীনতায় ভোগে।

আমরা লক্ষ্য করবো যে, এই উদাসীনতার পরিণতিতে ব্যক্তির মাঝে অশান্তি-হতাশা-বিষাদগ্রস্ততা-মানসিক অবসাদ এমনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, এগুলো থেকে মুক্তির জন্যে সে ভুল চিত্তবিনোদনের পথ বেছে নিচ্ছে-যা তার চিন্তা-চেতনায় ডেকে আনছে নিরন্তর অবক্ষয়। আলী (আঃ) মানুষের এই চিন্তা-চেতনাগত অবক্ষয় রোধকল্পে আভ্যন্তরীণ বা আত্মিক শক্তি বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে সুস্থ বিনোদনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন সুস্থ বিনোদনের জন্যে বই পড়া যেতে পারে যে বই মানুষের মনের খোরাক দেয়, আত্মিক এবং চিন্তাগত উৎকর্ষ সাধন করে। তিনি বলেছেন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় এবং নতুন অভিনতুন বিষয়বস্তুর মাধ্যমে নিজেদের অন্তরগুলোকে বিনোদিত করো, কেননা মনও শরীরের মতো ক্লান্ত হয়ে যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিমত হলো, মানুষের জন্যে একঘেঁয়ে কাজ বা একঘেঁয়ে জীবন বিরক্তিকর এবং তা মানুষের শরীরকে অক্ষম করে তোলে। সেজন্যেই মানুষের উচিত হলো স্বাভাবিক ও একঘেঁয়ে জীবনের ছন্দে মাঝে মাঝে কিছুটা পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য আনা। যেমন মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো দেখার জন্যে ভ্রমণ করা বা এসবের ওপর পড়ালেখা করা। এগুলো অন্তরকে প্রশান্ত করে, সতেজ করে। খেলাধুলাও চমৎকার একটি বিনোদন-মাধ্যম। ইসলামে খেলাধুলার ব্যাপারে বলা হয়েছে খেলাধুলা শারীরিক শক্তি-সামর্থ বৃদ্ধি করা ছাড়াও মানসিক আনন্দেরও একটি মাধ্যম।

ইসলামে মানুষের সুস্থতা রক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই লক্ষ্য করা যাবে ঐশী শিক্ষা মানুষের জন্যে প্রাণদায়ী। যেমন রোযা অসুস্থ ব্যক্তির ওপর হারাম। একইভাবে

মাদক যেহেতু মানুষের শরীর মনের জন্যে খুবই ক্ষতিকর এবং জীবন চলার পথকে স্থবির কিংবা একবারে বন্ধই করে দেয় সেজন্যে ইসলাম মাদকদ্রব্যের ব্যাপারে তিরষ্কৃত এমনকি ভর্ৎসনা করা হয়েছে। মানুষের মনোদৈহিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ইমাম আলী (আঃ) ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, বিমর্ষ বা মাতাল ব্যক্তিদের ওপর আস্থা রেখো না। তিনি মুমিনদেরকে সুস্থ-সবল দেহের অধিকারী হবার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছেন! আলী (আঃ) নিজেও ছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তির বাইরেও সুস্থ-সবল দেহের অধিকারী। নবীজীর যে-কোনো আদেশ পালনের জন্যে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে সক্ষম।

মুমিনদের জীবন-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, উপযুক্ত নয় যে এই তিনটি কাজের বাইরে বিচক্ষণেরা আরো কোনো কাজ করবে। জীবনের শৃঙ্খলা বিধানের জন্যে অর্থনৈতিক কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়া , ধর্মীয় কর্মকাণ্ড তথা আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগি করা এবং পাপহীন চিত্তবিনোদন করা।

মালঞ্চ-৭

পাঠক ! ইমাম আলী (আঃ) এর চিন্তাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাহজুল বালাগা বিশ্লেষণমূলক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান মালঞ্চের আজকের আসরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। নাহজুল বালাগায় নিরাপত্তা বিষয়ে হযরত আলী (আঃ) এর গুরুত্বপূর্ণ বহু বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সংকলিত হয়েছে। আজকের আসরে আমরা অলঙ্কারপূর্ণ ও গভীর অর্থবহ সেইসব বক্তব্যের খানিকটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

সমাজের জ্ঞানী-গুণী মনীষীদের দৃষ্টিতে যুগ যুগ ধরে সামাজিক নিরাপত্তা, ন্যায়-বিচার এবং স্বাধীনতার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে নিরাপত্তা জীবনের মৌলিক দিকগুলোর একটি এবং সামজিক স্থিতিশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আর মানব উন্নয়ন ও বিকাশের অনিবার্য ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী। এ কারণেই মানুষের একটি পবিত্রতম প্রত্যাশা হলো এই নিরাপত্তা। আল্লাহর পক্ষ থেকে পূণ্যবানদের সমাজের জন্যে সুসংবাদ হিসেবে নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা নূরের ৫৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছেঃ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে আল্লাহ তাদের এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, পৃথিবীতে তিনি তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব বা খেলাফত দান করবেনই যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন। তিনি তাদের জন্যে তাঁর মনোনীত দ্বীনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি আর নিরাপত্তামূলক অবস্থায় পরিবর্তিত করে দেবেন।" মানুষের এই প্রাচীন আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ নিরাপত্তা তার অস্তিত্বের সাথেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। জীবন যাপনের প্রয়োজনে মানুষ পরস্পরের সাথে বিভিন্ন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে এবং এভাবেই একটি সমাজ বিনির্মাণ করে। তাদের এই সমাজ গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যটি হলো ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। হযরত আলী (আঃ) নাহজুল

বালাগায় বলেছেন ইতিহাসের কাল-পরিক্রমায় রাষ্ট্র গঠন কিংবা সরকার গঠনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো সার্বিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। একথা সর্বজন বিদিত যে ইমাম আলী (আঃ) ক্ষমতার মসনদ বা আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন নি, বরং তিনি এমন একটি সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন যার ছত্রছায়ায় মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, অপরের অধিকার নষ্ট করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, জনগণ নিজেদের সীমান্ত রক্ষা করে শত্রুদের মোকাবেলার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালায়।

হযরত আলী (আঃ) অবশ্য এই বক্তব্যটি রেখেছিলেন খারজিদের কথা মাথায় রেখে-যারা হযরত আলী (আঃ) এর হুকুমাতকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। নাহজুল বালাগায় তিনি বলেছেন-"তারা বলে হুকুমাত, বিচার বা শাসন-কর্তৃত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ। এ কথা সত্য। আরো সত্য যে মানুষ-চাই শাসক ভালো হোক কিংবা মন্দ-শাসকের মুখাপেক্ষী। মুমিন ব্যক্তিগণ হুকুমাতের ছায়ায় নিজেদের কাজে মশহুল হয় আর অমুসলিমরা তা থেকে উপকৃত হয়। হুকুমাতের কল্যাণে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে হুকুমাতের মাধ্যমেই বায়তুল মাল আদায় হয়, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই হয়, রাস্তাঘাট সুরক্ষিত হয়, সবলের হাত থেকে দুর্বল তার অধিকার রক্ষা করতে পারে। আর এগুলো সম্ভব হয় তখন যখন পুণ্যবানরা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে জীবনযাপন করতে পারে এবং বাজে লোকদের হাত থেকে নিরাপদ থাকে।"

হযরত আলী (আঃ) এ কারণেই নিরাপত্ত প্রতিষ্ঠা করাকে সরকারের দায়িত্ব বলে মনে করতেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তাকে একটি নিয়ামত হিসেবে গণ্য করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মৌলিক শক্তি হলো আল্লাহ এবং ইসলামের প্রতি ঈমান। নাহজুল বালাগায় এসেছে-সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সহজ পথের নির্দেশনা দিয়েছেন ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যে। তিনি ইসলামের স্তম্ভ করেছেন সুদৃঢ় যাতে কেউ একে ধ্বংস করতে না পারে। যারা ইসলামকে অবলম্বন করেছে তাদের জন্যে মহান আল্লাহ ইসলামকে করেছেন শান্তির উৎস। যারা বিশ্বাস স্থাপন করতে চায় তাদের অন্তরে দিয়েছেন বিশ্বস্ততা, যারা ইসলামের ওপর নির্ভর করতে চায় তাদের জন্যে দিয়েছেন আনন্দ। যে বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে চায় ইসলামকে তার জন্যে করেছেন ঢালস্বরূপ।

আলী (আঃ) এর দৃষ্টিতে একটি দেশে এমন পরিস্থিতি বিরাজ করা উচিত যেখানে কোনো মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়। তার মানে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি দেশের সরকারের মৌলিক একটি দায়িত্ব। এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়ে হযরত আলী (আঃ) বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। এখানে আমরা নাহজুল বালাগা থেকে একটি ছোট্ট উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ইমাম বলেছেন-চেষ্টা করো সততা ও

মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার। প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে বিশ্বস্ত থেকো। সৎ পথ অনুসরণ করো। অহমিকা থেকে দূরে থেকো। আগ্রাসন বা সীমালঙ্ঘন করা থেকে বিরত থেকো ইত্যাদি।

মুসলমানদের এই মহান নেতা মানুষের জান-মালের হেফাজত করা এবং সম্মান রক্ষা করাকেও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অংশ বলে মনে করেন। সেজন্যে তিনি তাঁর বক্তব্যে কিংবা উপদেশে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আলী (আঃ) তাঁর শাসনকালে যখন শুনতে পেলেন যে একদল লোক মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে এবং তাঁরই শাসিত এলাকার ভেতর ইহুদি এক মহিলা লাঞ্ছিত হয়েছে তিনি ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললেন-এই ঘটনায় শোকে-দুঃখে কেউ যদি মরেও যায়, তাহলে তাকে তিরস্কৃত করা হবে না।

মালঞ্চ-৮

পাঠক ! ইমাম আলী (আঃ) এর চিন্তাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাহজুল বালাগা বিশ্লেষণমূলক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান মালঞ্চের আজকের আসরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। নাহজুল বালাগায় নিরাপত্তা বিষয়ে হযরত আলী (আঃ) এর গুরুত্বপূর্ণ বহু বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে গত আসরে আমরা খানিকটা আলোচনা করেছিলাম। আজকের আসরে ন্যায়কামী ও সত্যান্বেষী এই মহান মনীষীর অলঙ্কারপূর্ণ ও গভীর অর্থবহ বক্তব্যের আরো কিছু দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

মানুষের অধিকার জাগরণের ক্ষেত্রে আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) এর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো ইসলামী শিক্ষার আলোকে আলোকিত। জুলুম-অত্যাচার, নিরাপত্তাহীনতা বা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো। আলী (আঃ) কে যে-ই চিনতে পারবে সে অবশ্যই ভালোভাবে উপলব্ধি করবে যে, অত্যাচারের মোকাবেলায় তিনি কখনোই শান্তভাবে চুপ করে বসে থাকতে পারতেন না, চেষ্টা করতেন সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাঁর এই চেষ্টা-প্রচেষ্টার বিষয়টি তাঁর চিন্তা-ভাবনা, বক্তৃতা-বিবৃতি তাঁর শাসনকার্য এবং তাঁর অনুসৃত নীতি-আদর্শের মধ্যেই সুস্পষ্ট। শ্রেণী-বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে,দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে এবং শোষণ-বঞ্চনা ও অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি ব্যাপক সংগ্রাম করেছেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনকালে মানুষকে ন্যায়-নীতির স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন।

গত আসরে আমরা নাহজুল বালাগায় বিধৃত নিরাপত্তা বিষয়ক কিছু বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আজকের আসরে সে বিষয়টির খানিকটা নজর বুলানোর চেষ্টা করা যাক। যারা শাসক তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্য হলো ব্যক্তিগত এবং সামাজিক নিরাপত্তার পাশাপাশি মানুষের জন্যে রাজনৈতিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা। এ

ব্যাপারে এমন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে সকল শ্রেণীর মানুষই তার সুফল ভোগ করতে পারে। আসলে রাজনৈতিক নিরাপত্তার মানেই হলো এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে আপামর জনগণ নিঃসঙ্কোচে, নির্ভয়ে তাদের আশা-আকাঙ্খার কথা বলতে পারে। আলী (আঃ) তাঁর হুকুমাতকালে রাজনীতি বা হুকুমাতের বিকৃত অর্থটিকে দূরীভূত করার চেষ্টা করেছেন। বিকৃত অর্থে মানে হুকুমাত বলতে মানুষ বুঝতো একধরনের স্বৈরশাসন বা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া জগদ্দল পাথর। আলী (আঃ) এই ধারণাটি পাল্টে দিলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হুকুমাত আসলে পরিচালনা, অংশঅদারিত্ব, দায়িত্বশীলতা এবং জনগণের সেবা করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আজারবাইজানের স্বল্পকালীন গভর্নর ছিলেন আস্আস ইবনে কায়েস। ইমাম আলী (আঃ) এই আস্আসকে একটি চিঠিতে লিখেছেন- গভর্নরের পদ তোমার জন্যে মজাদার কিছু নয় বরং এটা তোমার ঘাড়ে চাপানো একটা আমানত, তাই তোমার উচিত হলো তোমার কমান্ডার এবং তোমার ইমামের আনগত্য করা। মানুষের ওপর স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড করা কিংবা আদেশ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকার তোমার নেই। তোমার হাতে মহান আল্লাহর দেওয়া বহু সম্পদ রয়েছে। তুমি হচ্ছো সেইসব সম্পদের কোষাধ্যক্ষ, তোমার দায়িত্ব হলো সেইসব সম্পদ আমার কাছে সোপর্দ করা। ইমাম মনে করতেন সমাজে রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার সবচেয়ে বড়ো কারণটি হলো স্বৈরশাসন যা মানুষের অসৎ গুণাবলির মূল। সে জন্যেই ইমাম আলী (আঃ) তাঁর কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে যখন চিঠিপত্র লিখতেন সেখানে বলতেন তারা যেন অহমিকা না করে,শ্রেষ্ঠত্বকামী না হয়।

তিনি আরো তাকিদ দিতেন যে শাসক এবং জনগণের মাঝে পারস্পরিক অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দেওয়া যায় তাহলে সামাজিক নিরাপত্তা,শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই সমাজের লোকজনের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতিশীল সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এ কারণেই ইমাম আলী (আঃ) তাঁর শাসনকালের শুরু থেকেই জনগণের ওপর তাঁর কোনোরকম কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন নি যাতে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয়। এমনকি তাঁর বিরোধী ছিল যারা,তাদের কারো ওপরেও কোনোরকম চাপ সৃষ্টি করা হয় নি বা তাদের নিরাপত্তা কখনোই হুমকির মুখে পড়ে নি। আলী (আঃ) জনগণকে ভালোবাসতেন এবং তাদেরকে নির্বাচনের অধিকার দিতেন।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়টিও ইমাম আলী (আঃ) এর দৃষ্টিতে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তিনি মনে করতেন অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতাই দারিদ্র্যের কারণ আর দারিদ্র্য ঈমানের দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বঞ্চিত জনগোষ্ঠির সমস্যা সমাধানে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে তিনি মনে করেন। জনকল্যাণে তাঁর ছিল গভীর মনোযোগ। তিনি মনে করতেন তাঁর হুকুমাতের একটি লক্ষ্য হলো সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। তিনি চেষ্টা করেছেন আভ্যন্তরীণ এবং বাইরের বিভিন্ন বিষয়ে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক

প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি কেবল তখনই বিরোধীদের মোকাবেলা করতেন যখন একেবারেই নিরুপায় হয়ে যেতেন অর্থাৎ যখন শান্তিপূর্ণ সমাধানের আর কোনো পথ খোলা না থাকতো। তিনি একটি চিঠিতে মালেক আশতারকে লিখেছিলেন, "শান্তি প্রস্তাব হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ, তাই শান্তিপ্রস্তাবকে কখনোই প্রত্যাখ্যান করো না। শত্রুরা যেটুকুই পেশ করুক না কেন। যোদ্ধাদের জন্যে প্রশান্তি,নিজেদের এবং দেশের জন্যে শান্তি নিশ্চিত হয় শান্তিচুক্তির মাধ্যমে। তবে শান্তিচুক্তির পর শত্রুদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। কেননা অনেক সময় শত্রুরা তোমাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করার জন্যে তোমার সমীপে হাজির হবে। তাই সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে ত্রুটি করবে না। এভাবে হযরত আলী (আঃ) নিরাপত্তা বিষয়টিকে সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক করণীয় বলে গুরুত্ব দিতেন। সত্যি বলতে কি ইমাম আলী (আঃ) এর দৃষ্টিতে যে সমাজে নিরাপত্তা নেই সে সমাজে সার্বিক ন্যায়মূলক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়।

মালঞ্চ-৯

পাঠক ! ইমাম আলী (আঃ) এর চিন্তাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাহজুল বালাগা বিশ্লেষণমূলক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান মালঞ্চের আজকের আসরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। নাহজুল বালাগায় হযরত আলী (আঃ) এর স্বরূপটা এমন একজন ইনসানে কামেলের মতো ফুটে ওঠে যিনি সত্বার বিস্ময় ও রহস্যের গূঢ়ার্থ সচেতন এবং যিনি দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যের সকল রহস্যকে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর গুণাবলী এমন এক বিষয় যা নাহজুল বালাগায় বারবার বর্ণিত হয়েছে। আলী (আঃ) আল্লাহর বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহ্যভাবে দিয়ে মানুষের চিন্তা-আবেগ-অনুভূতিকে এমন এক অনন্ত সত্যের সাথে পরিচিত করিয়ে তোলেন যে সত্য সম্পর্কে আমরা সবাই নিজেদের উপলব্ধি অনুযায়ী তাঁকে চিনতে পারি এবং যাঁর অপার দয়া ও রহমতের ছায়ায় আমরা জীবন যাপন করি।

হযরত আলী (আঃ) ৪৯ নম্বর খোৎবায় লিখেছেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর। যিনি সকল গোপন বস্তু সম্পর্কে অবহিত এবং সত্বার সকল প্রকাশ্য বস্তুই তাঁর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কখনোই কারো চোখের সামনে তিনি প্রকাশিত হন না। যে চোখ দিয়ে তাকে দেখে না, সেও তাঁকে অস্বীকার করতে পারে না। যে হৃদয় তাঁকে চিনেছে সেও তাকে দেখতে পায় না। তিনি এতো মহান, মর্যাদাবান এবং উন্নত যে তাঁর সঙ্গে তুলনা করার মতো কোনো কিছুর অস্তিত্বই নেই। আবার তিনি সৃষ্টিকূলের এতো কাছে যে, কোনো কিছুই তাঁর চেয়ে বেশি কাছের হতে পারে না।

আলী (আঃ) এর দৃষ্টিতে আল্লাহ হলেন সকল সত্বার উৎস এবং সৃষ্টির সবকিছু তাঁর কাছ থেকেই উৎসারিত। আকাশ এবং যমিনে যা কিছু আছে সবকিছুই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন। আর সৃষ্টিকূল যেহেতু তাঁর সাথেই সম্পর্কিত,সেহেতু সকল বস্তুই তাঁর মর্যাদা এবং তাঁর একত্বের লেশপ্রাপ্ত। আল্লাহর বান্দাগণ তাঁর সক্ষমতা,তাঁর কৌশল এবং তাঁর দয়অ-

দিাক্ষিণ্যের কাছে অনুগত ও আত্মসমর্পিত। যদিও বান্দাদের আনুগত্যের কোনো প্রয়োজনীয়তা আল্লাহর কাছে নেই। বরং আনুগত্য বান্দার নিজের মর্যাদা বা সৌভাগ্যের জন্যেই প্রয়োজন।

আলী (আঃ) জনগণের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন তারা যেন আল্লাহকে সময় এবং স্থানের সীমিত গণ্ডির মাঝে অবরুদ্ধ বলে মনে না করে কিংবা তাঁকে কেউ যেন নিজের সাথে তুলনা না করে। আল্লাহকে চেনার জন্যে তাঁর সৃষ্টির বিস্ময়ের প্রতি মনোনিবেশ করলেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বিশালত্ব এবং মহান মর্যাদার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে। নাহজুল বালাগায় তিনি মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন- হে যথার্থ কাঠামোযুক্ত সৃষ্টি! হে মায়ের পেটের অন্ধকারে লালিত সত্তা! সৃষ্টির শুরুতে তুমি ছিলে কাদার তলানি। তারপর তুমি নির্দিষ্ট একটা সময় আরামের একটি জায়গায় সুরক্ষিত ছিলে। সেই মায়ের পেট থেকে তোমাকে বের করে এমন এক পৃথিবীতে আনা হয়েছে যেই পৃথিবীকে তুমি ইতোপূর্বে দেখো নি এবং লাভের পথ কোন্টা-তাও জানতে না। তাহলে চুষে চুষে মায়ের দুধ খাওয়া কে শেখালো? দরকারের সময় ডাকা বা চাওয়ার পন্থাটি তোমাকে কে শেখালো?

তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি তার নিজের বর্ণনায় ভারসাম্য রক্ষা করতে অক্ষম সে নিঃসন্দেহে তার প্রতিপালকের প্রশংসার ক্ষেত্রে আরো বেশি অক্ষম। আলী (আঃ) অপর এক বর্ণনায় বলেছেন মানুষের সুখ-শান্তি আর সুস্থিতির মূল উৎস হলেন আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহকে খোঁজার জন্যে তাই মানুষ তার আধ্যাত্মিক শক্তি,তার জ্ঞান-বুদ্ধি ,বিচার-বিবেচনাকে কাজে লাগায় যাতে খোদার প্রেমের রেকাবিতে পা রাখা যায় এবং তাঁর নিকটবর্তী হয়ে অমোঘ শক্তি লাভ করা যায়। তিনি নিজে আল্লাহর প্রেমের রশ্মিতে মহান স্রষ্টার সান্নিধ্যে এতো উর্ধ্বে পৌঁছেন যে, এই পৃথিবী এই জীবন তাঁর কাছে খুবই তুচ্ছ বিষয় ছিল এবং সবসময় আল্লাহর প্রশংসা বাণী তাঁর মুখে হৃদয়গ্রাহী শব্দে গুঞ্জরিত হতো। বলা হয় যে, রাত ঘনিয়ে আসলে কিংবা আঁধারের পর্দা নেমে আসলে প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহর বিশেষ প্রশংসার মুহূর্ত।

আসলে আলী (আঃ) আল্লাহকে এতো গভীরভাবে চিনতেন যে স্বয়ং রাসূলে খোদা (সা) তাঁর প্রশংসা করতেন। সেইসাথে রাসূল চাইতেন জনগণ যেন তাঁর ওপর কথা না বলে কেননা আলী (আঃ) হলেন আল্লাহর প্রেমে বিমোহিত।

মালঞ্চ-১০

ইমাম আলী (আঃ) এর চিন্তাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাহজুল বালাগা বিশ্লেষণমূলক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান মালঞ্চের আজকের আসরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। গত আসরে আমরা নাহজুল বালাগায় বিধৃত আলী (আঃ) এর মূল্যবান কিছু বক্তব্য শুনে আল্লাহর মহান কিছু বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। আসলে নাহজুল বালাগা হচ্ছে বিশ্বের প্রতিপালক সম্পর্কে বা তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জানার জন্যে সমৃদ্ধ একটি ভাণ্ডার।

যাই হোক আজকের আসরেও আমরা তারি ধারাবাহিকতায় খানিকটা আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

আলী (আঃ) তাঁর বক্তব্যে আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে মূল্যবান অনেক কথাই বলেছেন। আলী (আঃ) যে খোদার কথা বলেছেন তিনি শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ কিংবা মানুষের সাথে অপরিচিত কেউ নন। তিনি জীবিত এবং সচেতন। মানুষের সাথে তাঁর কথাবার্তা বিনিময় হয়। তিনি মানুষকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করেন এবং তিনি তাদের আন্তরিক প্রশান্তি ও সন্তুষ্টির উৎস। সকল সৃষ্টিই নিজের অস্তিত্বের গভীরে তার সাথে গোপন রহস্যের সূতোয় বাঁধা। তাদের সবাই আল্লাহর প্রশংসায় লিপ্ত। অন্যভাবে বলা যায়,নাহজুল বালাগায় আল্লাহ খুবই প্রিয় সত্বা-মানুষের ভালোবাসার মূল উৎস। কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ীঃ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।

এ কারণেই হযরত আলী (আঃ) আল্লাহকে চেনার উপায়গুলো জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহর নিদর্শনগুলো নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা করা,অন্তরের সকল কালিমা দূর করে স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা আনা,সত্বার গভীরে ডুবে যাওয়া,আল্লাহর জিকির করা ইত্যাদিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির ভিত্তি বলে তিনি উল্লেখ করেন। ইমাম আলী (আঃ) সত্বাকে আল্লাহর সৃষ্টি বলে মনে করেন এ অর্থে যে বিশ্ব হলো সৃষ্ট বস্তু আর আল্লাহই তাকে তাঁর নিজস্ব কৌশলে সৃষ্টি করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো যে আল্লাহ যা সৃষ্টি করার কথা ভাবেন তা-ই সৃষ্টি হয়ে যায়। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞানী মহান স্রষ্টা।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুঁজে বেড়ায় তাকে ইমাম আলী (আঃ) বলেন সে যেন কোরআনে কারিমের প্রতি মনোনিবেশ করে। কেননা মানুষের চিন্তাশক্তি সীমিত। সে তার নিজের অপূর্ণ চিন্তা দিয়ে একাকী আল্লাহর মতো মহান সত্বাকে খোঁজার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারবে না। আলী (আঃ) বলেন-হে প্রশ্নকারী! যথার্থ দৃষ্টি দাও! কোরআন আল্লাহর যেসব গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছে তার প্রতি আস্থাশীল হও! তাঁর হেদায়েতের আলো থেকে উপকৃত হও! যা কিছু আল্লাহর কিতাব,নবীজীর সুন্নাত এবং অলী-আউলিয়াদের হেদায়েতের পথ থেকে দূরে রাখে এবং শয়তানের প্ররোচনা যাদের নিত্যসঙ্গী তাদের ত্যাগ করো। ঐশী আদর্শের শিক্ষকগণ জ্ঞানের পথে সদা অটল-অবিচল ছিলেন।

আলী (আঃ) আল্লাহর একত্বের ব্যাপারে বহু প্রমাণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এবং তারপর তাঁর আনুগত্য করা আমাদের জন্যে ফরয বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি আরো স্মরণ করিয়ে দেন যে,মানুষ খুবই দুর্বল এবং অক্ষম সৃষ্টি এবং তাই মানুষের উচিত সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করা, তার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকা এবং তার সন্তুষ্টির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা। এ প্রসঙ্গে ইমাম আলী (আঃ) তাঁর ছেলে ইমাম হোসাইন

(আঃ) এর উদ্দেশ্যে বলেছেন-জেনে রোখো হে আমার সন্তান! আল্লাহর যদি কোনো অংশীদার বা শরিক থাকতো তাহলে তাঁর নবীরাও তোমার কাছে আসতো। তুমি তাদের শক্তির নিদর্শন দেখতে এবং তাদের কর্মনৈপুন্য ও গুণাবলী সম্পর্কে জানতে। কিন্তু খোদা তায়ালা এক এবং একক সত্বা। যেমনটি তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন-তাঁর নিরঙ্কুশ একাধিপত্যে কারো কোনো রকম অংশিদারিত্ব নেই এবং তাঁর শক্তি নিঃশেষ হবার নয়। তাঁর অস্তিত্ব সবসময় ছিল এবং তিনি সকল কিছুর শুরু তবে তাঁর জন্যে শুরু বলে কিছু নেই। সবকিছুরই সমাপ্তি আছে কিন্তু তাঁর কোনো সমাপ্তি নেই। মানুষ তাঁর শক্তি সম্পর্কে যতোটুকু চিন্তা করতে পারে প্রকৃতপক্ষে তিনি তার চেয়েও অনেক উর্ধ্বে। এখন যেহেতু এই উপলব্ধি বা বোধ তোমার হয়েছে তাই আল্লাহর প্রতি অনুগত হও। তাঁর শাস্তিকে ভয় করো এবং তাঁর রাগের কারণগুলোকে পরিত্যাগ করো। কেননা খোদা তায়ালা তোমাকে পুণ্যকাজ ছাড়া আর কোনো কিছুর আদেশ দেন নি এবং মন্দকাজ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ব্যাপারে নিষেধ করেন নি।

আলী (আঃ) আল্লাহকে গভীর প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার সাথে চিনতেন এবং তাঁর ভালোবাসা পোষণের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত একটি বক্তব্য হলো-হে খোদা! তোমার বেহেশতের লোভে কিংবা তোমার জাহান্নামের ভয়ে আমি তোমার ইবাদাত করি নি,বরং তোমাকে ইবাদাতের উপযুক্ত এবং প্রশংসার যোগ্য জেনেই তোমার ইবাদাত করেছি। তিনি বিনীতভাবে এবং যথার্থ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর সান্নিধ্যের জন্যে বেদনাহতের মতো মোনাজাত করতেন। রাতের অন্ধকারে যখন সবাই গভীর নিদ্রায় ডুবে যেতো তখন তিনি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে গুঞ্জন করতে করতে বলতেন-হে খোদা! তুমি তো তোমার সকল প্রিয় বান্দার দুঃসময়ের সঙ্গী এবং যারা তোমার ওপর নির্ভর করে তাদের অভাব-অভিযোগের ব্যাপারে তুমি তো সবই জানো। হে খোদা! আমার জন্যে তুমি যা কিছু যথার্থ মনে করো তার নির্দেশনা দাও! আমার অন্তরকে উন্নতি-অগ্রগতির দিকে এবং পূর্ণতার দিকে ধাবিত করো-কেননা; এই অনুগ্রহ তোমার হেদায়াতের বাইরে নয়।